ছাত্রীদের অন্তরঙ্গ নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা শিবলোকপ্রাণা

সেই শুভ দিনটির কথা মনে হলেই মনটা আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দাগ রেখে যাওয়া দিন!

১৮৯৮, ১৩ নভেম্বর, পাতার মালা আর লাল নীল সবুজ কাগজের শিকল দিয়ে ১৬ বোসপাড়া লেনের ছোট্ট বাড়িটা সাজানো হয়েছে। ঢোকার পথে দরজার দুপাশে স্বস্তিকা আঁকা মঙ্গলঘট আর দুটো কলাগাছ—অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর জন্য রাখা। সিঁড়ির সামনে চালের গুঁড়ির আলপনা। নিবেদিতা অধীর আগ্রহে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ঘর-বার করছেন। গোলাপ মা ও যোগীন মার সঙ্গে 'মা' এলেন। বলরামভবন থেকে স্বামীজীও ব্রহ্মানন্দজী আর সারদানন্দজীর সঙ্গে এসে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা করে স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে স্কুলের ভাবী ছাত্রীদের উদ্দেশে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন : ''আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।''

পরদিন পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে নিবেদিতার স্কুল শুরু হল। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল পরিবারগুলি থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঝি মেয়েদের নিয়ে এল। তারা এমন লাজুক যে কেউ তাদের দিকে তাকালেই হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। কিছু বললেই অমনি মুখ ভার হয়ে চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। দৌড়ে কিন্তু কেউই পালাল না। ভয়ভয় করছে, আবার কৌতূহলও আছে। সিস্টারের বাড়িতে থাকতে পেয়ে খুশিই মনে হল তাদের।

অনেকবার নিবেদিতা কল্পনা করেছেন স্কুলটি কীভাবে শুরু করবেন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। অখণ্ড মনোযোগ আর সদাসতর্ক দৃষ্টি চাই এর জন্য। স্বামীজীর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তাঁর মুখে এক কথা : ওদের আত্মার আত্মীয় হতে হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে নাও। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সব কিছু শিখতে পারবে। পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাগবাজারের রক্ষণশীল হিন্দুদের আস্থাভাজন হতে পারবেন—এই আশা নিয়ে নিবেদিতা কাজে নামলেন। ছোট বালিকারাই তাঁর শিক্ষয়িত্রী হল। ছাত্রীরা অনিয়মিত আসে; কাজেই স্কুলের কোনও সুনির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। কখনও কোনও বৃদ্ধা তাদের নিয়ে আসেন স্কুলে, কখনও চোখে-কাজল

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে মা-ই পৌঁছে দেন মেয়েদের। মেয়েরা বড় হলঘরটায় জড়ো হয়। তারপর কয়েকদিন কথা না বলে কেবল পরস্পরকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সবাই মিলে খেলা করে না মোটেই। যদি বুঝল যে কেউ তাদের লক্ষ করছে না, তখন সাহস পেয়ে এ ওকে বালা-চুড়ি কী পুঁতির মালা দেখায়। প্রথমে তো কে কেমন চুল বেঁধেছে তাই পরস্পরকে দেখাবার ধূম পড়ে গেল। চুলের গোছা রেশমের দড়ি আর রংবেরঙের ফিতে দিয়ে লম্বা করা হয়েছে।

নিবেদিতা তাদের ধরন-ধারণ লক্ষ করেন। কেউ কোনওরকম নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার ধারে না। তবু কোথায় ওদের স্বভাবের মিল—নিবেদিতা তা-ই খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন। ওরা যে থেকে থেকে চুপ হয়ে যায়, অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে পারে, এই দুটোতে নিবেদিতার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। পূজা-অর্চনার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কারণ ওটা ওদের খেলার একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। অনেক মেয়েই মাটি দিয়ে যেমন-তেমন একটা মূর্তি গড়ে, তার সামনে দিনের মধ্যে হাজারবার ফুল দেয়। পুতুল নিয়ে যেমন, তেমনি এই দেবমূর্তি নিয়েও ওদের খেলা—কখনও ঘুম পাড়াচ্ছে আবার কখনও বকছে—যখন যেমন খেয়াল। এই যে মূর্তি গড়ে আর ভাঙে—এতে ওদের ভারি আনন্দ। তখন খুব হাসতে থাকে সবাই। ক্ষণভঙ্গের পিছনে নিত্য-সত্য-পূর্ণতা যে একটা আছে, এ ওদের অবচেতন মনে ঢুকে আছে। ফলে ওদের হাসিকান্নার ধরন পাশ্চাত্যের ছোট ছোট মেয়েদের থেকে একেবারে আলাদা। ভারতের মেয়েরা যেভাবে গড়ে উঠেছে, তার ধারা দূর অতীত থেকে এসেছে। এদেশের ধর্মাচরণ আর আচার-নিয়মের সংস্কার থেকে সহজেই তারা অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে আবাহন করে, আবার তাকে বিসর্জন দেওয়ার শিক্ষাও পায়।

নিজেদের ঘরোয়া চাল-চলনগুলি ছাত্রীরা স্কুলেও নিয়ে আসে। বড়রা যা করেন বাড়িতে, খেলতে গিয়ে ওরাও তা নকল করে। মাথায় জলের কলসি নিয়ে কাল্পনিক কুয়োয় জল আনতে যায়; পায়ে পায়ে জড়িয়ে হাঁটে, আর জল যেন একফোঁটা ছলকে না পড়ে সেদিকেও কড়া নজর। কখনও বা পাকাগিন্নি সেজে খেলা করে—মনগড়া অতিথিকে গড় হয়ে প্রণাম করে, সযত্নে খাবার সাজিয়ে দেয়। মা-ঠাকুমার মুখে শুনে রামায়ণ-মহাভারতের অজস্র গল্প ওদের কণ্ঠস্থ। মাটির উপরে ছবি আঁকতে এতটুকুও ক্লান্তি নেই ওদের। চাঁদ, সূর্য, কৃষ্ণের পায়ের ছাপ, পদ্ম—এই ওদের কাছে বিশ্বসংসারের প্রতীক যেন। জপের মালা ঘোরানোর নিষ্ঠা নিয়ে একই কাজ ওরা বারবার করে যায়।

এতদিন নিবেদিতা শিশুদের শিক্ষামূলক খেলাধূলা নিয়ে যে-গবেষণা করেছেন—এখানে তা কোনও কাজেই লাগছে না। জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই সেসব খেলার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতের এই মেয়েরা অনেক কিছুই জানে বোঝে। তাই তিনি অতি সাবধানে তাদের স্বভাবের এই ঐশ্বর্যকে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেন আর সাধ্যমতো কিছু লেখাপড়া শেখান। ওদের নীরস দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে একটু রং লাগে যেন। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ করেন—একটা দশ বছরের মেয়েও জানে তার অন্তরাত্মা ছাড়া আর কিছুই স্বাধীন নয়। জীবনটা তার যন্ত্র, বিয়ের পর এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে কুমারীজীবনের নিষ্কলঙ্ক শুচিতা—এই তার একমাত্র সম্পদ। জীবন সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য তার নেই, কারণ সেখানে গুরুজনের আদেশ পালন করে, অন্তঃপুরে গোপনচারিণী হয়ে থাকাই তার নিয়তি। বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে মুখে ঘোমটা টেনে, তাঁদের কথায় কথা না বলে নতমুখে দিন কাটানোই তার জীবনের রীতি। ওরই মধ্যে পরিবারে কোথায়

নিজের জায়গা তা বুঝে নিয়ে—নিজেকে মর্যাদার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা সে পায়। তবু তার ছেলেবেলায় মাধুর্য আর কল্পনার খামখেয়ালিপনা যথেষ্ট থাকে। তার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুই বজায় রাখতে চান নিবেদিতা। অন্তত স্কুলে সে ওটুকু পাক, আর এই বিশিষ্টতা তার সমস্ত কাজে সঞ্চারিত হোক।

মেয়েরা বড়ঘরে বসে কাজ করে। এক-একজনকে এক-একটা কাজ দেওয়া হয়েছে। পড়া, লেখা আর কিছু অঙ্ক—এই নিয়েই তারা খেলে। শিখতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। কেননা, তোতাপাখির মতো দুর্বোধ্য কতগুলি শব্দ তাদের আওড়াতে হয় না, তারা নিজেরাই এখানে এক-একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলে। শব্দ আর তার অর্থ—প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে তাদের ভাবনার মিল—এগুলো তারা আস্তে আস্তে বুঝে নেয়। এক দুই করে সংখ্যা গুনতে শেখে। সিস্টার তাদের অঙ্ক আর ছবি আঁকা শেখান। অবসরমতো ইংরেজি ভাষাও। তাঁর শেখানোর পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ও নতুন ধরনের। যাদের শেখার ও বোঝার ক্ষমতা কম—তারাও সহজে শিখে নিতে পারে। খেলার মধ্য দিয়ে পাঠ দেন। মেঝেতে এক ঝুড়ি তেঁতুলের বিচি রেখে অঙ্ক শেখান। যে যে-কটা গুনতে পারে সে-কটা সে হাতে তুলে নেয়। 'জোড় কি বিজোড়' খেলাতেই প্রথমে ছোট মেয়েদের যোগ-বিয়োগ অভ্যাস হয়, তারপর শ্লেটে লিখে অঙ্ক কষতে শেখে। মুখে মুখে কখনও তিনি জোড় সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে কেবল বিজোড়গুলি গুনতে বলেন, আবার তারপর বিজোড় সংখ্যা বাদ দিয়ে জোড়গুলি কেবল গোনান। এরপর একটি বিজোড় বাদ দিয়ে পরের বিজোড় কিংবা একটি জোড় বাদ দিয়ে পরের জোড় সংখ্যা—এভাবে গুনতে শেখান। এতে মেয়েদের যেমন স্মৃতিশক্তি বাড়ে তেমনই তারা মুখে মুখেই অঙ্ক সম্বন্ধে অনেকটা জেনে যায়।

ভারতীয় ভাস্কর্য ও ছবির উপরে নিবেদিতার বিশেষ অনুরাগ। ভারতবর্ষের এই শিল্পের মূলে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ রয়েছে তা তিনি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেন। মেয়েদের হাতে-আঁকা পিঁড়ি ও আলপনা তাঁর খুব আদরের। একটি মেয়ের হাতের আলপনা তাঁর শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন তিনি। তাতে একটি বড় শতদল পদ্ম ও চারপাশে ছোট ছোট জুঁইফুলের মতো ফুল আঁকা আছে। ওই আলপনা তাঁর এত ভাল লেগেছে যে, কেউ—বিশেষত গুণগ্রাহী কেউ এলেই তিনি তাঁকে ওই আলপনা দেখান। প্রায়ই বলেন : ''কী সুন্দর সাদা ছোট ছোট ফুলগুলি! সকলেই ওই বড় ফুলের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, যেন বলছে আমরা তোমার কাছেই যেতে চাই।" পদ্মফুলের ছবি তাঁর বড়ই প্রিয়। বলেন : ''এই ফুল ভারতবর্ষের মানুষ ছাড়া অপর কেউ আঁকতে জানে না।" একতাল কাদামাটি মেয়েদের দেন—তারা মহানন্দে মূর্তি গড়ে। মন থেকে কত কী তৈরি করে। নরুন এনে উৎসাহের সঙ্গে 'আমরা সকলেই শিখব' বলে পাথরে ও মাটিতে ছাঁচ কাটতে বসেন সিস্টার। মেয়েদের মধ্যে যে প্রথমে ছাঁচ তৈরি করে তাঁকে এনে দেয়—সেটি যত খারাপই হোক না কেন, তিনি খুব আদরের সঙ্গে তা নেন—দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ঠেকিয়ে রাখে, তেমনি করে মাথায় ছুঁইয়ে নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। ছোট মেয়েরা পুতুল গড়ে এনে তাঁকে দিলে একটি বাক্সে যত্ন করে তুলে রাখেন। তাঁর ঘরে মেয়েদের হাতে তৈরি জিনিস সমস্ত থরে থরে সাজানো থাকে। মাঝে মাঝে একদিন মেয়েদের ডেকে জিনিসগুলি দেখিয়ে তাদের হাতের কাজে কেমন উন্নতি হচ্ছে তা বুঝিয়ে দেন। শ্রীশ্রীমাকে তাঁর ছাত্রীদের হাতে তৈরি জিনিস উৎসাহের সঙ্গে দেখান—মাও তাঁর 'খুকি'র ছাত্রীদের তৈরি করা মূর্তি ইত্যাদি দেখতে বড় ভালবাসেন। ছোট ছোট কাপড়ের টুকরোর উপরে

সেলাই শেখান সিস্টার—সকলকেই হাত ধরে শিখিয়ে দেন, উৎসাহ দেন, আদর করেন। আনন্দ, উৎসাহ আর ভালবাসার প্রাণবন্ত মূর্তি যেন! বাড়ি ফিরেও তাই ছাত্রীদের সিস্টারপ্রসঙ্গই চলতে থাকে।

স্কুলে বড় মেয়েরা ছোটদের শেখায়। সিস্টারের শেখানোর পদ্ধতিটি তাঁর নিজের ভাষাতেই : ''মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাদের বলবে, আচ্ছা আমরা চেষ্টা করব, তা হলে নিশ্চয় শিখতে পারব। মেয়েরা যদি ভুল করে, তবে তাদের বলবে, হ্যাঁ, হল, কিন্তু আমরা আরও ভাল করতে চেষ্টা করব। যদি কোনও মেয়ে ঠিক করে বলতে পারে তবে তাকে বলবে, ঠিক, ঠিক, এবং অন্য মেয়েদের বলবে, আমরাও পারব, আবার আমরা চেষ্টা করব।'' কথা বলার সময় তিনি কতগুলি শব্দের উপর বিশেষ জোর দেন, যেমন 'নিশ্চয়' শব্দটি। আবার যখন কেউ ঠিক করে বলতে পারে—তখন 'ঠিক ঠিক' বলে বালিকার মতো আনন্দে হাততালি দেন। মেয়েদের লেখায় বা অঙ্কে যদি ভুল থাকে তবে তখনই তা ভাল করে কেটে দিয়ে বলেন, ''ভুল কখনও রাখবে না। ভুল বোঝা মাত্র কেটে দেবে।''

স্কুলের ব্যাপারে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ আগ্রহ। স্নেহের খুকিকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তিনি মেয়েদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে তুচ্ছ কথাটিও জেনে নেন। এদেশের মেয়েদের আর মায়েদের মনের ভাব বুঝিয়ে দেন। উৎসবের বিশেষ দিনে শ্রীশ্রীমা স্কুলে মেয়েদের জন্য মিষ্টি পাঠান। সেবছর ঠাকুরের জন্মতিথিতে কী আনন্দ—বিশেষ পূজা হল। তারপর সাতটি গাড়ি করে শ্রীশ্রীমা আর তাঁর সঙ্গিনীরা, নিবেদিতা এবং স্কুলের তিরিশ জন ছাত্রী—সবাই মিলে এক ভক্তের বাগানে বেড়াতে গেলেন। আনন্দের সঙ্গে নিবেদিতা চিঠিতে লিখলেন : ''...মোটেই ভেবো না যে তার মানে আমরা দুহাতে পয়সা উড়িয়েছি, চল্লিশটি প্রাণীর জন্য ঢালাও রকমের ব্যবস্থা হল। বুঝতেই পারছ, অথচ সবশুদ্ধ বারো টাকারও কম খরচ পড়ল। এখানে কিছু করাটা খুব ব্যয়সাধ্য নয়, বেশ মজার। না?''

মিতব্যয়ী হয়েও নিবেদিতার কিন্তু দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই ছিল না। মাত্র ছশো টাকা মূলধন। এই টাকায় কতটুকু কী করা যাবে—তার হিসেব করেন। স্কুলের খরচ চালানো শক্ত হয়ে উঠছে। বাজেটে যে মাথাপিছু এক টাকা করে মাসিক বেতন ধরা হয়েছিল, বেশিরভাগ মেয়ের অভিভাবকের তা দেওয়ারও সামর্থ্য নেই। উলটে অনেককে তো পরবার জন্য সুতির শাড়িখানাও কিনে দেন তিনি। অনেকগুলি মেয়ের চিকিৎসার খরচ আছে। এই তো মহামায়া নামে মেয়েটির যক্ষ্মা হয়েছিল—তাকে তার মা ও ভাইয়ের সঙ্গে পুরীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিকিৎসার খরচ তো আছেই। তাছাড়া নিবেদিতা ভাবেন—এরপর স্কুল যদি চলে আর উদ্দেশ্য যদি সফল হয়—তবে রিপোর্ট লিখে ইংল্যান্ডে আর ভারতবর্ষের সবজায়গায় ছড়িয়ে দেবেন। নিয়মিত সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে স্কুলটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

নিবেদিতার বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মিস ম্যাকলাউড পাশ্চাত্যে ফিরে যাওয়ার আগে একদিন এলেন বোসপাড়া লেনে। একটা পুরো সকাল মেয়েদের নিয়ে খেলা করে কাটালেন। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল ওঁর মনটা খুশিতে ভরা। কোনওদিকে বিশেষ নজর নেই। এদিকে কিন্তু বাড়ির যা কিছু অভাব-অনটন সবই লক্ষ করেছেন। মেয়েদের শীর্ণ চেহারা আর মার্গারেটের মানসিক চাঞ্চল্যে তিনি বিচলিত। সংকল্প স্থির হয়ে গেল। তাঁর টাকা আছে। মুক্তহস্তে মার্গারেটকে দিতে হবে, যাতে সে-ও পাঁচজনকে দিতে পারে। পরদিন গাড়িবোঝাই জিনিস নিয়ে ম্যাকলাউড এলেন। মেয়েদের জন্য টিনভরা বিস্কুট, আঙুর, জ্যাম, জমানো দুধ, মাখন, চিনি। তাছাড়া স্কুলের দরকারি জিনিস একরাশি, শ্লেট

থেকে শুরু করে খাতা, থান থান কাপড়, সুতোর রিল, কাঁচি আর বন্ধুর জন্য এনেছেন খানিকটা চা।

দুর্দিনে পড়ে শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হল; প্রাণের টান দ্বিগুণ বেড়ে গেল। জগন্মাতার আশ্রিত এক বিরাট পরিবারের পরিজন তাঁরা, প্রতিদিন মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান। দিনের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দের সময় হল যখন গল্পের আসর বসে। মেয়েরা সব ফেলে সিস্টারকে ঘিরে বসে চেঁচামেচি করতে থাকে, ''মায়ের কথা বলো, তিনি আমাদের কীরকম ভালবাসেন সেই গল্প করো''...।

আর নিবেদিতা সেই হাজারবার শোনা গল্প শুরু করেন, মা তাঁর অবোধ সন্তানদের কত যে ভালবাসেন সেই গল্প। সে তো গল্প নয়, সে যে সবটাই সত্য।

''আচ্ছা খুকুসোনা, ছোটবেলায় সবার আগে কী দেখেছিলে মনে পড়ে? তুমি মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছ—এই না? মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছ? মা চোখ বুজলেন—ওমা! খুকি কোথায় গেল? চোখ মেলে দেখেন, এই যে খুকি!... আচ্ছা, খেলা রাখো। বলো দেখি, 'মা, মা একবার দেখা দে—চোখ মেলে চা গো'...।'' এমনি গল্প চলতে থাকে। ছোট মেয়েরা চোখ বড় বড় করে তাকায়, যেন এমনি করে মাকে দেখে ফেলবে তারা। আর নিবেদিতার মনে হয়, মা হাসিমুখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পিঠে।

প্রথম, স্কুল চালানোর জন্য টাকা চাই। দ্বিতীয়, বাল্যবিবাহের জন্য নিবেদিতার অতি যত্নে ও ভালবাসায় ঘেরা ছোট্ট ফুলের কুঁড়িগুলির লেখাপড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে—স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—এ তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে। অবশেষে স্বামীজীর পরামর্শ মেনে নিলেন নিবেদিতা। এদেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চাইলে স্কুলে কেবল অল্প সময়ের জন্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করলে চলবে না। যাদের তিনি শেখাতে চাইছেন তাদের সমস্ত জীবন তাঁর হাতে থাকতে হবে। সেজন্য একদল শিক্ষয়িত্রী তৈরি করতে হবে। প্রথমে একটি আশ্রম চাই। আর এসব কিছুর জন্যই চাই টাকা। নিবেদিতা বাগ্মী, লেখিকা এবং কর্মী। ঠিক করলেন অর্থসংগ্রহের জন্য স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে যাবেন।

১৭ নং বোসপাড়ার স্কুলবাড়িটির দরজার গায়ে লেখা হল 'ভগিনী নিবাস'। পাড়ার মানুষদের কাছে 'ভগিনীরা' বলতে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন আর পরিচারিকা বেট (নিবেদিতার সঙ্গে এসেছিল তাঁর বাড়ি থেকে)। বাড়িটি একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। উপরের ঘরগুলি ছোট, ছাদও নিচু। গ্রীষ্মকালের দুপুরে ঘরগুলি এত গরম হয় যে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকলেই মাথা ধরে যায়। শীতের দেশের মানুষ—কী কষ্টই না সহ্য করেছেন তাঁরা! এমনকী ঘরে একটি টানা পাখাও নেই। একটি হাতপাখামাত্র নিবেদিতার কাছে আছে। ও-ঘরে দিনের বেশিরভাগ সময়ই লেখাপড়ার কাজে ডুবে থাকেন, এমন একাগ্র হয়ে কাজ করেন যে শীত-গ্রীষ্ম বোধই থাকে না। কখনও কখনও কাজ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ান—তীব্র গরমে চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। একবার এঘর-ওঘর ঘুরে ছাত্রীরা কে কোথায় কী করছে দেখে আসেন। এক-এক দিন কপালে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে চেপে ধরেন—জিজ্ঞাসা করলে বলেন—'মাথায় কষ্ট'। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার গিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান।

এই লেখাপড়ার কাজও সবটাই তাঁর স্কুলের জন্য। স্কুলের খরচের জন্য বই লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন বিভিন্ন পত্রিকায়। এত পরিশ্রম করেও যখন খরচের টানাটানি হয়, তখন নিজের ব্যক্তিগত খরচ কমিয়ে দেন। নিজের শরীররক্ষার জন্য যে সামান্য খরচ হচ্ছে—সেটিও তখন তাঁর কাছে অসহ্য। ফলে শরীর দিনদিন রক্তহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে—

তখন বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেন : ''তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে...।''

নিজের উপার্জনের সবটুকু অংশ স্কুলের জন্য খরচ করার অনুমতি দিয়ে গিয়েছেন নিবেদিতা, পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে। শরীর যাওয়ার মাত্র ছদিন আগে, ৭ অক্টোবর ১৯১১ উইল তৈরি করলেন : ''বস্টনশহর নিবাসী উকিল মি. ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার নামে যে তিনশত পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, এবং আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ত্ব আমার আছে—সেইসকল আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামীজীর মঠের ট্রাস্টিগণকে দিতেছি। তাঁহারা ওই অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহারা মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলের পরামর্শমত উহার আয় মাত্র ওই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন।'' সেই টাকা আজ নিবেদিতা স্কুলের মূল তহবিলের উৎস—শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করি।

স্কুলে তখন নির্দিষ্ট পাঠ্যবই নেই, কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে মুখে মুখে পড়ানো হয়। সেলাই, ছবি আঁকা, খেলাধূলাই প্রধান। স্কুলের নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই, যখন-তখন ছাত্রীরা এসে হাজির হয়। রাস্তায় সিস্টারকে দেখলে ছুটে তারা কাছে আসে, তিনিও তাদের ডেকে আদর করেন—'আমা মেয়ে' অর্থাৎ 'আমার মেয়ে' বলে। তাদের নানারকম উৎপাতও সহ্য করেন। একটি মেয়ের খুব ছবি আঁকার ঝোঁক। একদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে ছবি আঁকতে গিয়ে সিস্টারের নতুন রঙের বাক্স শেষ করে ফেলল—তুলি দিয়ে চিত্রবিচিত্র করে একটি নতুন বইও নষ্ট করল। অবশ্য পরে অপরাধ স্বীকার করায় সিস্টার খুশি হলেন।

নিবেদিতা নিজেকে পরিচয় দেন শিক্ষিকা বলে। তিনি একজন শিক্ষাবিদ। অল্প সময়ের ভিতর পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্রীর মধ্যে আঠাশ জনের একটি রিপোর্ট তৈরি করে ফেললেন। এই রিপোর্ট থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, তখনকার হিন্দুসমাজের মেয়েদের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান, ছাত্রীদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পর্কে জানা যায়। কে কতদিন স্কুলে উপস্থিত থেকেছে—তার হিসেবও পরিষ্কার ওই রিপোর্টে। একইসঙ্গে সিস্টারের এই বিবরণ ও মন্তব্যগুলি শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য। কারও সম্পর্কে লিখেছেন : ''পিতামহীর সঙ্গে তার স্বভাবের বেশ মিল আছে—তাঁরই মতো বুদ্ধিমতী, মিশুকে ও অমায়িক। রঙের কাজ চমৎকার। হাতের কাজে গভীর অনুরাগ ও তাতে সে তন্ময় হয়ে যায়—বার বার করেও ক্লান্ত হয় না। সহজেই ভদ্র ব্যবহার শিখেছে—ইংরেজি ভালই শিখছে।...'' মেয়েটিকে সিস্টারেরও ভালই লাগে। কারও চমৎকার হাসিখুশি স্বভাব—সবসময়ে সন্তুষ্ট, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকার আগ্রহ রয়েছে—এমনকী বাড়িতে কাজের জন্য দেরি হলেও স্কুলে আসা চাই। বইগুলি বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে। আঁকা খুব সুন্দর কিন্তু সেলাই অত্যন্ত খারাপ। সিস্টার যতজন বলিষ্ঠ চরিত্রের মেয়ে দেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম। সাহস ও অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে, রুচিবোধও। প্রথমে বড়ই অবাধ্য ও বেয়াড়া গোছের ছিল—একদিন সিস্টার তার সঙ্গে শান্তভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর থেকে তার পরিবর্তন হয়েছে—এখন সিস্টারের সস্নেহ হাসিই মেয়েটির পক্ষে যথেষ্ট। দুঃখ করে লিখেছেন : ''তার মধ্যে তেজ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি রয়েছে কিন্তু বিবাহে সবই নষ্ট হয়ে যাবে।''

নিচুজাতের একটি মেয়ে সম্পর্কে মজা পেয়ে লিখেছেন : ''অন্তকরণ খুব ভাল। বাড়িতে কাজকর্ম করে, পড়াশোনা একেবারেই পছন্দ করে না—তাকে লেখাপড়া করানো দুঃসাধ্য। কিন্তু ক্লাসঘর পরিষ্কার করতে বা বেটকে সাহায্য করতে বললে খুব খুশি।'' প্লেগের সময় যখন সিস্টার সেবাকাজে পল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছেন, তখন সে সবসময় তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। কত ছোট ছোট ঘটনাও সিস্টারের মনে রেখাপাত করেছে। লিখেছেন, ওই মেয়েটির মায়ের একটি ছোট দোকান আছে। সেখানে একদিন সিস্টার কলা কিনতে গেলে সে একটু কম দাম নিতে চাওয়ায় মায়ের কাছে বকুনি খায় এবং লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে—সিস্টার তা ভুলতে পারেননি। আর একটি ছাত্রীর সম্পর্কে লিখেছেন, সে ভারি চালাক ও অদ্ভুত। গলার স্বর কর্কশ কিন্তু কেমন ভাল আর চটপটে! তার চেহারা ও স্বভাবে বিন্দুমাত্র লাবণ্য বা ভব্যতা নেই কিন্তু দয়ার প্রতিমূর্তি। সে এবং তার একটি ভাই প্রতিদিন বিকেলে এসে সিস্টারকে বাংলা শেখায়।

ভগিনী ক্রিস্টিন

কিন্তু খুব কম ছাত্রীই নিয়মিত স্কুলে আসে। তাদের লেখাপড়া সম্পর্কে অভিভাবকদের তেমন কোনও আগ্রহই নেই। গোঁড়া রক্ষণশীল কিছু পরিবারে মেয়েদের বই পড়া বারণ। কেউ অল্পদিনের জন্য স্কুলে এলেও কিন্তু সিস্টার তাকে ভোলেন না। খবর নেন, কেন আসছে না। নানাভাবে চেষ্টা করেন, যেন ওরা নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে। দুজন ছাত্রী সম্পর্কে লিখেছেন, মেয়ে দুটি বেশ সুশ্রী ও সৎ। তারা কোনও গয়না পরে না আসায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু স্কুলে আসার ব্যাপারে খুব খামখেয়ালি—আর বাড়িতেও তাগাদা দিয়ে বা জোর করে স্কুলে পাঠাবার কেউ নেই। কাজেই বুদ্ধিমতী হলেও তাদের জন্য কিছু করা যাবে না।

স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতির প্রধান বাধা বাল্যবিবাহ। একজন ছাত্রী সম্বন্ধে হতাশ হয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, সে বিবাহ না করতে দৃঢ়সংকল্প। তার তীক্ষ্ণ বিবেক, অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং যথেষ্ট সতেজ কাণ্ডজ্ঞান আছে। উচ্চভাব সহজে ধরতে পারে। বিবাহ থেকে তাকে রক্ষা করা উচিত।... কিন্তু তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি! এমন প্রায়ই ঘটে!!

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন বুঝতে পারছেন—এভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যাবে না। বাড়ির অভিভাবকদের, মা-বাবাকে আগে বোঝাতে হবে—হিন্দু-আচার, নিষ্ঠা ও ধর্মবোধ এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে—তাঁরা চাইছেন মেয়েদের মধ্যে একটা নতুন ভাব ঢুকিয়ে দিতে—তাদের আত্মবিকাশের একটা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে তাঁরা উপায় বেছে নিলেন, মায়েদের—বাড়ির মহিলাদেরও লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাঁদেরও খানিকটা অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হতে শেখাতে হবে—তার ফলে তাঁদের চিন্তায়ও স্বাধীনতা আসবে।

মেয়েদের স্কুলে দেখামাত্র, ''এই যে আমার মেয়ে এসেছ?'' বলেই হাতজোড় করে অভিবাদন জানান নিবেদিতা। মেয়েরা উঠে নমস্কার করার আগে চলেও যান। তাঁর সময় কোথায়? সবসময়ই

যে কাজে ব্যস্ত! ক্লাসও খুব কম নেন। তাঁকে দেখাও যায় খুব কম। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য সত্তা সারা বাড়িতে যেন মিশে থাকে। বক্তৃতা দিতে তিনি বাইরে গেলে স্কুলবাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে। যা কিছু নতুন উদ্ভাবন সবই তো তাঁর। অবশ্য খানিকটা তাঁর অভাব পুরিয়ে দেন সিস্টার ক্রিস্টিন। সারাজীবন ধকল সয়ে আর দায়িত্বের বোঝা বহন করে ক্রিস্টিনের চরিত্র হয়ে উঠেছে কঠিন ইস্পাতের মতো। যে-কোনও কাজের ভার দিয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করেন নিবেদিতা। ''...পড়াশোনা কাজকর্ম আর দেখাসাক্ষাতেই সমস্তটা সময় ওর কেটে যায়। ওর জীবনে আড়ম্বর নেই, ব্যস্ততা নেই, নেই কোনও জটিলতা। সরল প্রাণ যাদের, তাদের সঙ্গে সরল তার ব্যবহার। ক্রিস্টিন যেন নারীত্বের মূর্ত আদর্শ।'' —চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা।

প্রথমদিকে সিস্টার নিজে প্রতিদিন সেলাই আর আঁকার ক্লাস নিতেন। পরে ইতিহাস আর ইংরেজিও নিতে শুরু করলেন। সিস্টারের কাছে ইতিহাস পড়তে মেয়েরা কী ভালবাসে! সেসময় তিনি এত তন্ময় হয়ে যান যে, তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি কোথায় আছেন ও কাদের কাছে বলছেন, তা যেন তাঁর মনেও নেই। খুব ইচ্ছা ছিল, ছাত্রীদের তীর্থস্থান এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়ে আনবেন—কিন্তু অর্থাভাবে তা কোনওদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই নিজের ভ্রমণকাহিনি নানাভাবে ছাত্রীদের কাছে বর্ণনা করেন।

একদিন রাজপুতানার ইতিহাস বলতে বলতে, তিনি নিজে যখন চিতোর গিয়েছিলেন তাঁর সেই সময়ের ভ্রমণকাহিনি বলতে শুরু করলেন : ''আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম''—বলতে বলতে নিবেদিতা সত্যিসত্যিই চোখ বুজে হাতজোড় করে বসলেন। তাঁর তখনকার মুখের ভাব কখনও ভোলা যায় না। বলতে লাগলেন : ''অনলকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষ চিন্তা মনে আনিতে চিন্তা করিলাম। আঃ কী সুন্দর! কী সুন্দর!'' বলতে বলতে ভাবাবেগে মুগ্ধ নিবেদিতা চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন। তিনি যে স্কুলঘরে ছাত্রীদের ইতিহাস পড়াচ্ছেন—তা আর তাঁর মনে নেই; পদ্মিনীর শেষ চিন্তায় তাঁর মন লীন হয়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষের কথা উঠলেই ভাবে বিহ্বল হয়ে যান নিবেদিতা। মেয়েদের বলেন, ''ভারতবর্ষের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা মা!'' এই বলে জপমালা হাতে নিয়ে নিজেই জপ করতে শুরু করেন—মা, মা, মা। মুগ্ধ হয়ে মেয়েরা দেখে।

নিবেদিতার কণ্ঠে যেন মধু আছে—তাতেই তিনি সবার মন কেড়ে নেন। চোখের স্বচ্ছ-দ্যুতি দেখে মেয়েরা বলাবলি করে, ''নিবেদিতা যেন মা সরস্বতী; স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন আমাদের মধ্যে। সরস্বতীর মতোই ধবধবে ওঁর গায়ের রং, তেমনই নির্মল দুটি চোখের চাউনি।'' এই সাদৃশ্যটা মনে আসে বলেই—সরস্বতীপূজা যেন আরও জমজমাট হয় মেয়েদের কাছে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে পূজা। সিস্টার খালি পায়ে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করতে। ভোগ রান্না করতে বামুন আসে। রকমারি মিষ্টির সঙ্গে নানারকম রান্না হয়। ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ বিতরণ। পল্লির মহিলাদের উপর কাজের ভার দেন নিবেদিতা—তারা ছাদে এসে জড়ো হয়। বছরে এই একটি দিন নিবেদিতা সাদা রেশমের শাড়ি পরেন—কপালে বিভূতি, দুই ভুরুর মাঝখানে লাল চন্দনের টিপ, হাতে একটি ঘট নিয়ে গঙ্গাজল আনার জন্য বাইরে আসতেই সবাই একসঙ্গে আনন্দধ্বনি করে ওঠে। তিনিই যেন বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পূজামণ্ডপ তৈরি হয়েছে। ফুলে সাজানো বেদির

উপরে খাগের কলম, পেন্সিল, বইয়ের রাশি আর মরালবাহিনী বীণাপাণির একটি প্রতিকৃতি। সামনে পুষ্পপাত্র আর নৈবেদ্য সাজানো। পূজা করলেন নিবেদিতা নিজে। যোগীন মা মন্ত্র বলতে বলতে দেখিয়ে দিলেন কী কী করতে হবে।

খানিকটা রাত হলে বাইরের সবাই চলে গেলে মেয়েরা মাটির প্রদীপ জ্বালায়, বাজি পোড়াতে আরম্ভ করে—নিবেদিতা চুপ করে বসে থাকেন পূজামণ্ডপে।

পাশ্চাত্যে বক্তৃতা দিয়ে যে-টাকা সংগ্রহ হয়েছে, সেই টাকাতেই স্কুলের তহবিল। কিন্তু স্কুলের উন্নতির জন্য ওই টাকা যথেষ্ট নয়। আমেরিকান বন্ধুদের কাছ থেকে কখনও কখনও কিছু টাকা আসে। মহা আড়ম্বরে পরোপকার করতে চান এমন অনেকেই আছেন কিন্তু নিবেদিতার ইচ্ছা নেই তাঁদের দান গ্রহণ করার, কারণ টাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের মতবাদ ও উপদেশও চাপিয়ে দিতে চাইবেন। কেউ প্রশ্ন করলে নিবেদিতা বলেন, ''আমরা একটা স্বরাট বিদ্যানগর গড়ে তুলছি।'' মনে আশা, ১৬ বোসপাড়ার ছোট্ট কিন্ডারগার্টেন স্কুলটি একদিন বিশ্ববিদ্যালয় হবে। অনেকে তাঁকে অহংকারী বলেন—তিনি গ্রাহ্যও করেন না। লেখা আর বক্তৃতায় যা রোজগার হয়, সবই খরচ করেন স্কুলের জন্য। প্রায় সারাদিনই তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়ার কাজ নিয়ে কাটে। এক পরিচারিকা কেবল মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে চা দিয়ে আসে—আর ঘরের কোণে বসে জপ করে। লেখাপড়া জানে না বেচারি, অন্য কাজও তেমন পারে না, পারে কেবল জপ করতে। নিবেদিতা ঘাড় নেড়ে বলেন, ''বেশ, বেশ, ঠাকুরকে ডাক! আমার কাজ যেমন খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা, ওটা তেমনি তোর কাজ। যে যার সাধ্যমতো মায়ের সেবা করি আমরা।''

নিবেদিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর ছোট স্কুলটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে—সেটি আজ বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও বাংলার একটি নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিনের তপস্যার, সাধনার ফসল—'সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল'।

সিস্টারের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্‌কালে বারবারই মনে হয়েছে, যদি আজ তিনি শরীরে থাকতেন, তাঁর স্নেহের 'আমার মেয়েরা'—বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে গরিমায় গুণের ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে মর্যাদার আসন লাভ করছে, তাঁর নাম উজ্জ্বল করছে—দেখে কত খুশিই না হতেন! আনন্দে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠত!

স্কুল বসার আগে সিস্টার ব্যস্ত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—প্রতিটি ক্লাসঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে আসছেন—শুনছেন, মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে : 'নমস্কার সিস্টার'—তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখটি ভেসে উঠছে মনের আয়নায়।

আরও মনে হয়, অতি আধুনিকতা যে আজ ভারতবর্ষের মেয়েদের—বিশেষত বাঙালি মেয়েদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে প্রায় নষ্ট করে দিচ্ছে, তারা ধর্মবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের ভোগবাদ—উপযোগবাদকে খুব বেশি করে গ্রহণ করছে—সিস্টার আজ থাকলে দেখে বড় কষ্ট পেতেন। তবে আজ তাঁকে ওই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা পেতে হত না—তাঁর ছাত্রী বালবিধবা ছোট্ট মেয়েরা—গোঁড়া হিন্দু সমাজের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ—একাদশী বা অন্য কোনও উপবাসের দিন কিছু না খেয়ে স্কুলে এসেছে—মুখগুলি শুকিয়ে গেছে, সিস্টারের হাতের ছোঁয়া জল বা খাবারও তারা খেতে পারবে না। কষ্টে সিস্টারের বুক ফেটে যেত। কত বিনিদ্র রাতে তাঁর চোখের সামনে ওই কচি মুখগুলি ভেসে উঠেছে—কীভাবে ওদের এই যন্ত্রণার অবসান ঘটবে ভেবে তাঁর চিন্তাস্রোত মাঝেমাঝেই এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

সিস্টারের আক্ষেপের সীমা থাকত না যখন দেখতেন, কত আগ্রহী মনোযোগী ছাত্রীকে লেখাপড়া অসম্পূর্ণ রেখে বাল্যবিবাহের জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। সমাজের অনুশাসন মেনে না চললে তার অভিভাবককে হয়তো সারাজীবন 'একঘরে' হয়ে থাকতে হবে। বাল্যবিবাহের সপক্ষে কোনও যুক্তি দিয়েই স্বামীজী তখন সিস্টারকে শান্ত করতে পারেননি। সিস্টার ব্যর্থতায়, হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। আজ মেয়েদের উপর থেকে সমাজের এই কঠোর হৃদয়হীন রীতি তুলে নেওয়া হয়েছে, অবশ্য অনেক মনীষীর অবদান রয়েছে এর পিছনে। ছাত্রীরা ইচ্ছামতো যতদূর খুশি লেখাপড়া করতে পারছে—যে-কোনও বিষয় নিয়ে। এ দেখলে সিস্টারের কি আনন্দে চোখে জল আসত না? ওঁদেরই প্রার্থনার ফল তো আজকের মেয়েদের মাথায় আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ছে!

সিস্টারের সঙ্গে কোথাও যাওয়া মানে ছিল শুধুই আনন্দ—কেবলই নতুন নতুন জিনিস শেখা। যেদিন নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর যাবার সময় বড় স্টিমার চলে যাওয়ার পর ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা দুলতে শুরু করল—মেয়েরা সব ভয়ে জড়সড়—সিস্টার কেমন উৎসাহ দিয়ে বললেন : ''ভয় কী? ঢেউ দেখে ভয় পেয়ো না। ভাল মাঝি খুব শক্ত করে হাল ধরে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে—আমরাও হাল ধরতে শিখব, তাহলে আর কখনও ভয় আসবে না।'' মুহূর্তে সবার ভয় কোথায় পালিয়ে গেল—সিস্টার কাছে থাকলে আর ভয় কী? সিস্টার যে শক্ত হাতে হাল ধরতে শিখিয়ে দিয়েছেন!... আজ যখনই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন আমাদের সকলেরই কি এই অনুভূতি হয় না, সিস্টার তো আমাদের হাল ধরতে শিখিয়েছেন শক্ত হাতে—আমরা নিশ্চয়ই সব বাধা, সব ভয় কাটিয়ে উঠতে পারব!

সিস্টার যেদিন ছাত্রীদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যান সেদিন ক্যাঙারুর ঘরের সামনে এসে ওদের অবাক চাউনি দেখে কেমন বললেন, ''বাচ্চাগুলো ভয় পেলে বা অজানা কিছু দেখলে দৌড়ে গিয়ে মায়ের পেটের থলিতে লুকোয়—আমরাও ভয় পেলে বা বিপদ দেখলে মায়ের কাছে—জগজ্জননীর কাছে—তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে লুকোব—তিনি যে আমাদের পরম নির্ভরস্থল—আমরা সবাই নিশ্চিন্তমনে তাঁর শরণাগত হব।''

জন্মে বিদেশিনী কিন্তু কর্মে ও ভাবনায় আন্তরিকভাবে ভারতীয় নিবেদিতা পরাধীন ভারতের সমস্ত ছাত্রসমাজকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিলেন, তাদের চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন তুলেছিলেন। শুধুমাত্র ছাত্ররাই নয়, শিল্পী তাঁর কাছে ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শিখেছেন, দেশসেবক পরাধীনতার গ্লানি মোছাতে ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় ভারতবর্ষের ললাটে জয়ের তিলক এঁকে দিয়েছেন, সাহিত্যিক সাহিত্যরচনায় ভারতের সমৃদ্ধির গৌরবের জয়গান গেয়ে উঠেছেন। ভারতবর্ষ তো কেবল দেশ মাটি পাহাড় জল নয়—সে যে জননী স্বয়ং। সিস্টারের কাছে এসে ছাত্রীরা ভারতবর্ষের বেদিমূলে নিজেদের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিত। ভারতের মানচিত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে—সিস্টারের কাছে ভূগোল পড়ে, আর সিস্টারের জপমন্ত্রের অনুরণনে তারা ভারতবর্ষকে ভালবেসে ফেলত। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা... তাঁর মুখে ওই পবিত্র মন্ত্র শুনে—হৃদয়ে শিহরণ জেগে ওঠেনি এমন কোনও ছাত্রী কি ছিল তখন?

'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', আর সেকাজ করবে গার্গী মৈত্রেয়ীরাই। স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সত্য প্রমাণ করতে এগিয়ে আসার দায় কি স্বামীজীর স্বপ্নের এবং নিবেদিতার ধ্যানের 'নিবেদিতা স্কুলে'র ছাত্রীদের বহন করার সময় আসেনি এখনও?